জননীর
নাভিমূলে
গাঢ় হয়
লাঞ্ছনার
ক্ষত

জননীর নাভিমূলে গাঢ় হয় লাঞ্ছনার ক্ষত

স্মৃতি ভদ্র

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

জননীর নাভিমূলে গাঢ় হয় লাঞ্ছনার ক্ষত

স্মৃতি ভদ্র

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট

২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২৭৫ টাকা

Jananir Nabhimule Gahro Hoy Lanchhanar Khoto by Smriti Bhadra Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 275 Taka RS: 275 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-29140-5-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন

www.kobibd.com or www.kanamachhi.com

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

www.rokomari.com/kobipublisher

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

স্বপ্নকে যারা কখনোই দুঃস্বপ্ন হতে দেয় না,
এমন সকল সাহসী মানুষের জন্যই আমি
বারবার লেখায় ফিরি

ভূমিকা

ত্রিমাত্রিক জীবনের গড়পড়তা গল্প লিখতে গিয়ে প্রায়শই কলম বিদ্রোহ করে বসে। জীবনের সূক্ষ্ম বিষাদ ও নিগূঢ় শূন্যতার প্রবল গল্পগুলো তৈরি হতে হতে গিয়ে ঠেকে কোনো এক বিপ্লবী অচেনা পথে। বদলে যাওয়া পৃথিবীর বিভ্রান্ত বাতাস শব্দগুলোকে নিয়ে জড়ো করে কোনো এক নতুনতর পৃথিবীতে। সে পৃথিবী সম্ভাবনার। সে পৃথিবী ইতিহাসের। আবার কখনো সে পৃথিবী শুধুই পরাজয়ের।

সে নতুন পৃথিবী পরিভ্রমণে বিদ্রোহী কলম কখনো খুঁজে নেয় মানুষ তাড়ুয়াদের, কখনো ক্ষয়ে আসা সময়ের, কখনো ধন্যি রাজাদের পুণ্য দেশের গল্প। সেসব গল্প যুগে যুগে রং আর নাম বদলানো বাহিনীর আড়ালে মানুষবেশী কাকেদের উৎপাতের কথাই বলে যায় নির্বিকারভাবে।

যাদের উৎপাতে জমির বুকে হেমন্তের চাঁদ নয় বরং গেড়ে বসে নৈতিকতাবিহীন উদ্বাস্তু সময়।

জননীর নাভিমূলে গাঢ় হয় লাঞ্ছনার ক্ষত গল্পগ্রন্থে তাই সম্মিলিত হয় বিষণ্ন সময়ের বিপন্নতা। যা আমাদের শুধুই বিব্রত করতে আসে শব্দবন্ধের নির্মম কালো রূপ হয়ে।

সূচিপত্র

অওরত ১১
ফেরা ২৯
চশমা ৩৬
ব্যারিকেড ৪১
ডায়েরি ৪৯
অসুখ ৫৬
অ-কাল ৬৭
নিখোঁজ সংবাদ ৭৪
ছাদ ৮১

অওরত

তেঁতুল তলে উঁচা পিঁড়া ঘিরে ঝলমল করে বাতি
জামাই আমাগের বইসে আছে তো
কইন্যা দান করো গো বাপ লো
কইন্যা দান করো, রাজুবালা রে দান করো
হায় রে, পিতলের কলসি লইয়া যাব যমুনার জলে
যমুনার জল কালো...

সোনাডাঙা বিলের জলে পানসি ভাসিয়ে বিকেল গড়তে না গড়তেই বরযাত্রীর দল পৌঁছে গেছে বিনসারা গ্রামের নিধু মাহাতোর বাড়ি।

এ বছর ধানের ডোল উপচানো দেখেই নিধু মাহাতো ঠিক করে ফেলেছিল রাজুবালার বিয়ের ঘর। এ গ্রাম সে গ্রাম খুব বেশি ঘুরতে হয়নি তাকে মেয়ের জন্য উপযুক্ত শ্বশুরবাড়ি খুঁজে পেতে। খৈগাড়ি বিলের পাড়ে নিমাইচড়া গ্রামে রঘুনাথ রাজভরের বাড়িতে কখানা কড়ি, মাছ-মিষ্টি আর একধামা ধান দিয়ে মেয়ের জন্য পাটিপত্র করে এসেছিল বিলে নতুন জল পড়ার আগেই। কথা ছিল শ্রাবণ মাসে মথুরাদিঘি মন্দিরে অষ্টপ্রহর শেষ হলেই বিয়ের পানসি ভিড়বে নিধু মাহাতোর বাড়ির দুয়ারে।

রঘুমাথ রাজভর এক কথার মানুষ। আর নিজের ছেলেটিকেও চেনেন খুব ভালো করে। তাই অষ্টপ্রহরের লীলাকীর্তন শেষ না হলে যে ছেলে হরিপদকে থুবড়ার অন্ন খাওয়ানো সম্ভব হবে না, তা তিনি ভালো করে জানতেন। তাই রঘুনাথ রাজভর নিজে পঞ্জিকা ঘেঁটে অষ্টপ্রহর শেষ হবার পরের পূর্ণিমায় বিয়ের দিন ঠিক করেছেন।

হরিপদ রাজভর, একমাত্র সন্তান হবার সকল রকম সুবিধা নিয়ে প্রায়শই বাড়ি ছাড়া থাকেন। বাবা রঘুনাথ অবশ্য এতে খুব একটা বিচলিত হন না। কারণ আচরণ বংশপরিক্রমায় নিম্নমুখী এটা তিনি জানেন। কিন্তু মালতী রাণীর অন্তর মানে না। বিয়ের পর বছরপাঁচেক আঁটকুড়ে থাকার সকল গঞ্জনা ভুলিয়ে দিয়ে হরিপদ তার কোলে এসেছিল। আমপাতায় পাড়া কাজলের টিপ পরিয়ে আর ছয়দিনে বাদলবাড়ি পিরের থানে মানতের বাতাসা ছিটিয়ে ছেলের নাম রেখেছিলেন হরিপদ। তাই ছেলে মালতী রাণীর অন্তরের টুকরো।

কিন্তু তেল-জল আর দুধ-মাছে বড় করা ছেলেটি যে একটু বড় হতে না হতেই মায়ের হাত ভুলে করতাল হাতে তুলে নেবে, তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি মালতী রাণী। তাই রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বারান্দায় মতি রুহিদাসের কীর্তনের দলের সঙ্গে যখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে হরিপদ সারাদিন পড়ে থাকত, তখন মায়ের মন বাচ্চা মানুষ বলে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে ছেলেকে ঘরে নিয়ে আসত। তবে এই প্রবোধ খুব বেশিদিন মালতী রাণীকে স্বস্তি দিতে পারে নাই। খুব তাড়াতাড়িই কীর্তনের দলের সদস্য হয়ে হরিপদ পালা গাইতে অন্য গ্রামে গিয়ে বুঝিয়ে দিল নিছক শখের বসে সে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে বসে থাকত না।

তখন কতইবা বয়স হবে হরিপদর আট কিংবা নয়। শৈশবের গন্ধ তখনও ছিল হরিপদর গা জুড়ে। সেই বয়সে মায়ের কোল ছেড়ে অষ্টপ্রহর হরিনাম গাইতে যে ছেলে পাঁচ গ্রাম দূরে সাতদিন কাটিয়ে আসতে পারে সে যে বড় হতে হতে দিনের গুনতি মাসে নিয়ে ঠেকাবে তাতে মালতী রাণীর সংশয় ছিল না।

আজকাল হরিপদ পালা গাইতে দক্ষিণবঙ্গে যায়। ডিঙি নয়, বজরায় তিন-চার দিন জলে ভেসে সে গাইতে যায় হরিনাম সংকীর্তন বড় বড় দলের বায়না পেয়ে। আর দক্ষিণে যাওয়া মানেই দিন-মাসের সব হিসাব ভুলে যাওয়া। শেষবার তো প্রায় চার মাস পর বাড়ি ফিরেছিল হরিপদ। বাছার এই ঘরছাড়া রোগ মালতী রাণীকে অস্থির করে তোলে, বুঝতে পারেন বাঁধন ছাড়া হরিপদকে ঘরমুখো করা যাবে না।

তাই সদ্য কৈশোর পেরোনো ছেলের জন্য বিয়ের কন্যা খোঁজার আবদারে অটল থাকেন স্বামীর সকল বাধা উপেক্ষা করে, 'আরে! আমার ছেলে তো আমার মতোই হবি! উঠতি বয়সে আমিও যাত্রাপালায় ঘুরি বেড়াতাম। তাতে কি আমার জাত গ্যাছে গা? সংসারের জোয়াল কাঁধে একবার পড়লি সব হাউস শ্যাষ। ছেলের হাউসে আড়া ক্যান দিতি চাও তুমি?'

বাছাধনের হাউসে কেন বাধা দিতে যাবে মালতী রাণী? তার শুধু একটাই চাওয়া হরিপদ চোখের সামনে সামনে থাকুক। সংসারে জোয়াল তো নয় মালতী রাণী চায় একটা ফুটফুটে বউ নিয়ে বাছা আনন্দ-সুখে দিন পার করুক। রঘুনাথ রাজভরের বিঘাখানেক মাঠাল জমি, বাজারে জুতা সেলাইয়ের দোকান, তিনখানা দুধেল গাভি, তিনকাঠা মাটির দোচালা বাড়ি আর মালতী রাণীর বারো আনি সোনার মটরদানা হার থাকতে বাছাকে কেন কাঁধে সংসারের জোয়াল নিতে হবে? রঘুনাথ রাজভর খুঁজেপেতে একটা ফুটফুটে কন্যা জোগাড় করুক বরং হরিপদর জন্য।

মালতী রাণীর ইচ্ছা রঘুনাথ রাজভরকে উতরিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বুঝিবা। তাই তো বিলে নতুন জল পড়তেই পুবের গ্রাম থেকে প্রস্তাবখানা প্রায় উড়েই এলো সেদিন। কন্যার গায়ে ফুল পড়েছে সবে। হাতেপায়ে বাড়ন্ত কন্যা বয়সের আগেই বয়স্থা হয়ে ওঠায় তড়িঘড়ি শ্বশুরঘর

খুঁজছে বাবা। সেই খোঁজ এ গ্রাম ও গ্রাম হয়ে হরিপদর গ্রামে এসে পড়তেই একজন কন্যার বাবাকে নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন মালতী রাণীর উঠোনে, 'কুটুম আসিছে বউ... উলু জোগাড় দাও গো...'

সন্তোষ রুহিদাস, মানুষখানা সারাক্ষণ হাসিঠাট্টায় মেতে থাকে। আর গ্রামের বউগুলোকে দেখলে সে ঠাট্টায় যুক্ত হয় নানারকম ইঙ্গিতপূর্ণ কৌতুক। সেসব কৌতুক শুনে গ্রামের বউয়েরা ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে হাসলেও গলায় কপট শাসনের সুরে বলে, 'ঠাকুরপো, ময়-মুরুব্বি তো মানতি হয়, নাকি? তোমার চেংরা বুদ্ধি আর পাকবি না...'

এসব শাসনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্নেহ যে কেউই আন্দাজ করতে পারে। সন্তোষ রুহিদাস বছরের অর্ধেক সময় নিয়ম করে বাজারের মোড়ে ব্রাশ, ফার্মা, আলপিন, পেরেক, মাততুল, কৌটার রং দিয়ে বাক্স সাজিয়ে জুতা সেলাইয়ের জন্য বসলেও বাকি সময় কীর্তন করে বেড়ায়।

অনাথ সন্তোষ রুহিদাসের এই সংসারে আপন বলে কোনো স্বজন নেই। এ কারণেই মনে হয় মানুষটি সুযোগ পেলে আত্মীয়তায় বেঁধে দেয় নানাজনকে। তেমন সুযোগের আঁচ সেদিন পেতেই নিধু মাহাতোকে নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিল রঘুনাথ রাজভরের বাড়িতে।

নিধু মাহাতো, ছোটখাটো গড়নের একজন মানুষ। ধুতির খুটা দুহাতের মাঝখানে রেখে নমস্কার করার ভঙ্গিতে কথা বলেন সবসময়। ঘাড় ঝুঁকে সামনে একটু কুঁজো হয়ে থাকেন এমনভাবে যে পৃথিবীর সকল ভার কেউ তাকে বয়ে চলার আদেশ দিয়েছে। আর এতসব অনুষঙ্গ পেরিয়ে একবার যদি তার মুখের দিকে তাকানো যায় তবে একটা দারিদ্র্যের হাড় জিরজিরে লাবণ্যহীন চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। তাই প্রথম দফায় সন্তোষ রুহিদাসের সঙ্গে মানুষটিকে দেখে মালতী রাণী খুব একটা পাত্তা দেননি। আর উলু জোগাড় দেবার কথাটা নিছক মশকরা ভেবে উঠোনে দুখান পিঁড়ি পেতে দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সন্তোষ রুহিদাস ইশারায় জল-বাতাসা দেবার ইঙ্গিত করে যখন বলে উঠেছিল, 'শাশুড়ি কেমন বউমা চান গো... কন্যার বাপে জানতি চায়...'

নিধু মাহাতো যেন এই কথাটারই অপেক্ষায় ছিলেন। চট করে দাঁড়িয়ে দুহাতের ভেতর ধুতির খুঁট ধরে বলতে লাগলেন, 'মেয়ে আমার সোমত্ত হৈল কি হৈল নাই সি কথা না বলি, তয় সংসারের সকল কাজ করতি পারে ইক্কেবারে বড় মাইনষের লাহান...গ্রামের মাইনষে কয় ভবানী মায়ের মুখখান কাটি বসায়ে দিছে মেয়ের মুখে আর দেড় দিঘত চুলে তাক ডাঙ্গর লাগে খুব...'

মালতী রাণী সত্যিই প্রস্তুত ছিলেন না এমন কথার। সন্তোষ রুহিদাসের ঠাট্টা মশকরা ভেবে নতুন মানুষটির দিকে মনোযোগও দেননি না সেভাবে। কিন্তু নিধু মাহাতোর মুখে কন্যা বৃত্তান্ত শুনে মালতী রাণীর আচমকা বোধোদয় হলো। তিনি

বারান্দায় চটের আসন পেতে জল বাতাসায় আপ্যায়ন করার ফাঁকে খবর পাঠালেন বাজারে, 'বাড়িত যাতি হবি... হরিপদ'র জইন্যি সম্বন্ধ আসিছে...'

বেলা তখন গড়ায়ে বিকেলের দিকে যাচ্ছিল। দোকানের ঝাঁপ ফেলে দুখানা সন্দেশ আর পোয়াখানেক লেডিকেনি হাতে ধরে রঘুনাথ রাজভর বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভেবেছিলেন, 'উপযুক্ত কন্যার খোঁজ কি আর এমন করি উড়ে আসে নাকি... বিয়ের কথা উঠলি জলমিষ্টি খাইতি আসে সক্কলে এমনিই এমনি...'

কিন্তু সেই দুখানা সন্দেশ আর কখানা লেডিকেনির গতি হবার আগেই হরিপদর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। কন্যা দেখা নেই, পাটিপত্রের মাছ মিষ্টি নেই—এ কেমনতর পাকা কথা?

আসলে হরিপদর বিয়ের জন্য মালতী রাণী যতই আকুলিবিকুলি করুক না কেন রঘুনাথ রাজভরের কোনো সায় ছিল না পুত্রের অকাল পাণিগ্রহণের আয়োজনে। তাই মুখে কিছু না বলিয়া উপযুক্ত কন্যা খোঁজায় ছিল তার মন ছিল নিমরাজি। এজন্য মাস তিনেক ধরে দুয়েকটা যা উড়ো প্রস্তাব এসেছে সবগুলোই নাকোচের খাতায় ফেলে রঘুনাথ রাজভর সন্তুষ্টিতে ভুগেছেন, 'উপযুক্ত কন্যা না পালি কেমন করি বিবাহ দেব হরিপদর...'

কিন্তু কে জানত আষাঢ়ের এক দুপুরে নিতান্তই সাদামাটা উঠোনটা হরিপদর জীবনকে অকস্মাৎ আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলবে। আর আড়ম্বরের ছকটা রঘুনাথ রাজভর সেদিন স্বয়ং নিজেই এঁকেছিলেন মনে মনে, 'কইন্যা সুর ধরতি পারে এই কথাখান আগে বলতি হতো নিধু মশায়... আমাগের হরিপদও মতি রুহিদাসের কের্তনের দলে গায়... এইটো তাহলে রাজযোটক হবিনি রে সন্তোষ...'

ব্যস, কন্যা না দেখেই রঘুনাথ রাজভর নিধু মাহাতোকে মোটামুটি কথা দিয়ে ফেললেন, 'পনেরোই আষাঢ় কন্যা দেখি এক্কেবারে পাকা কথা দিয়ে আসপো আমরা...'

মালতী রাণী দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্বামীর এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখে বুঝে গেলেন তার হরিপদর জীবন সোনাডাঙা বিলের ঘাটেই বাঁধা পড়ল। আর সেই সঙ্গে বিলের জলে দাপিয়ে বেড়ানো, ডুব দিয়ে শালুক কুড়োনো, ডিঙি ভাসিয়ে ছয়আনি বিলের সাদা বক তাড়িয়ে বেড়ানো এক মেয়ের নিয়তিতে লেখা হয়ে গেল আসন্ন সময়ের এক দুর্বোধ্য সময়ের গল্প।

বিলের বুকে জল বয়ে যায়। দিন গড়ায় সময়ের নিয়মে। আষাঢ়ের পূর্ণ চাঁদে বিলে আসে ভর জোয়ার। সেই জোয়ারে দিনে হাঁড়ি ভরা রসের মিষ্টি, বারোহাত তাঁতের শাড়ি আর পাঁচ টাকা দিয়ে রাজুবালার মুখ দেখে রঘুনাথ রাজভর। কিশোরী রাজুবালার ছটফটে চাহনির আড়ালে গভীর চোখ আর থুতনির টোলে জমে থাকা লাবণ্য সবকিছু ম্লান হয়ে গেল বাতাস উজিয়ে আসা তীক্ষ্ণ সুরে,

আর যে ধৈরত ধরতে নারি
আর যে ধৈরত ধরতে নারি

আমি মুরলির ধ্বনি শুনি
আহা মরিরে...

দুটাকা রাজুবালার মাথায় ছুঁইয়ে রঘুনাথ রাজভর কিশোরী কন্যার দায় হতে নিধু মাহাতোকে উদ্ধারের ইঙ্গিত কুলনারীদের উলু জোগাড়ের ধ্বনি হয়ে সোনাডাঙা বিলের বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগল। পঞ্জিকায় লগ্ন মিলিয়ে বিয়ের দিন ধার্য করা হলো জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায়।

হাতে খানিক সময় পেয়ে নিধু মাহাতো খুশি হয়েছিল খুব। তার বড় আদরের কন্যা রাজুবালা। কন্যাকে সে আর যাইহোক না সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারে না। ডোলার ধান হাটে বেঁচে কানের একজোড়া সোনার ফুল, রুপার রুলি আর জরিপাড়ের শাড়ি জোগাড় করতে তার মাসখানেক প্রায় লেগে যাবারই কথা। তার সঙ্গে বরযাত্রীদের আপ্যায়নের অনুষঙ্গও তো ছিল। তাই একমাস সময়ও যে কম পড়ে যেতে পারে ভেবেই পরের সপ্তাহে পৌঁছে গিয়েছিলেন হরিপদর বাড়ি। কখানা কড়ি, বিলের একটা কালবাউশ আর একধামা ধান দিয়ে পাটিপত্র করে এসেই শুরু করে দিয়েছিলেন বিয়ের সকল জোগাড়যন্ত।

কিন্তু যার বিয়ের জন্য খৈগাড়ি আর সোনাডাঙার বিলে ডিঙি ভাসছে এদিন-সেদিন সেই হরিপদই কিন্তু তখন পর্যন্ত অজানা ছিল সেই খবরে। মালতী রাণী তার ছেলেকে চিনতেন। যতই ঘরছাড়া মন থাকুক হরিপদর নাড়ি তো পোঁতা সেই ঘরের কোণেই। তাই নিমাইচড়া গ্রামের রঘুনাথ রাজভরের বাড়িতেও শুরু হয়ে গেল বিয়ের নানারকম মেয়েলি আচার।

বিলের মাটি এনে বাস্তু বানানো হয়, বিন্নি ধানের খই ভাজা হয়, মাটির হাঁড়ি হলুদ গুলে রাঙানো হয়। মালতী রাণীরও একমাত্র পুত্রের বিয়ে। বাছার মন ঘরে বাঁধা পড়বে এতদিন পর। তাই মনের আনন্দে তিনিও স্যাকরার কাছে রুপার মাকড়ি বানাতে দেন নতুন বউয়ের মুখ দেখবে বলে। রঘুনাধ রাজভরও গঞ্জ থেকে গরদের পাঞ্জাবি কেনেন, সোনালি কল্কিতোলা জমিনের শাড়ি কেনেন, পদ্মফুল আঁকা টিনের বাকশো কেনেন হাতের সময় ফুরিয়ে আসার আগেই।

এতসব আয়োজনের আড়ালে মালতী রাণীর চোখ যার জন্য সকাল-বিকাল বিলের ঢেউয়ে ঘুরে বেড়াত সে ফিরল এক সন্ধ্যায় পানসি নৌকায় ভেসে, 'মা, দেখরে রে মা তোর জইন্যি হরিবাসরের মেলা থিকি নক্ষীর কৌটো আনিছি...'

হরিপদ ছেলেটিই এমন। ঘরে থাকলে মা মা করে সারাবেলা মাতিয়ে রাখে। আবার সুযোগ পেলে এই মাকে ভুলেই দিনের পর দিন ঘরের বাইরে কাটিয়ে দেয় কীর্তনীয়া হয়ে। বাছাধনের এই 'মা' ডাকহীন দিনগুলো যে মালতী রাণীর কীভাবে কাটে তা একমাত্র জানে তার গোবিন্দ। সেই গোবিন্দই হরিপদর জন্য লক্ষ্মীমন্ত কন্যা জুগিয়ে দিয়েছে মালতী রাণীর ডাকে সারা দিয়ে—এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল লক্ষ্মীর কৌটো দেখে, 'ও বাবা, তুমি কী করি জানিলে নক্ষী ঘরে আসিপে?

কেমন করি তুমি ওত দূরে বসি ঘরের নক্ষীর জন্য কৌটো কেনার কথা মনে করিলে?'

ওমা! সে আবার জানতে হয় নাকি? প্রতি পূর্ণিমায় হরিপদর মা তো ঘরে রাখা লক্ষ্মীঠাকুরের পটে জল-বাতাসা না দিয়ে জল পর্যন্ত খায় না। সেই পটের লক্ষ্মীকে কেন ভুলে যাবে হরিপদ? কী সব উলটাপালটা কথা বলছে মা, 'মা, কেমন করি ভাবলি তোর পটের নক্ষী ঠাকুরের কথা আমি ভুলি যাব? কত শখ করি তুই পতি পূর্ণিমায় তাক সাজাস সে কি আমি খিয়াল করিনি মনে করিছিস?'

ছেলের কথায় হাসির হুল্লোড় উঠেছিল মালতী রাণীর শরীরে। ঘর ছেড়ে দূরে থাকলেও বাছাধন যে বদলায়নি মোটেও এটা দেখে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন সবকিছু নিয়ে। কারণ মা-বাবা অন্তঃপ্রাণ হরিপদ যে বিনাবাক্যে ছাদনাতলায় মায়ের হাতে দুধ-মিষ্টি খেয়ে পানসিতে উঠবে সোনাডাঙা বিলের পাড়ে অপেক্ষায় থাকা কন্যার জন্য, তা নিয়ে সকল সন্দেহ দূর হয়েছিল সেইকালে মালতী রাণীর।

কিন্তু ব্যাপারটা অতটাও সহজ ছিল না। নতুন বাস্তুতে কাঁচা রং দেখেই উৎসুক হয়ে উঠেছিল হরিপদ, 'মা, মা রে বাড়িত কুনু অনুষ্ঠান হবি বলি মনি হইতিছে...কী অনুষ্ঠান কী বৃত্তান্ত ক দেখি না...'

ছেলেকে বিয়ের বাদ্যি শোনানোর দায়িত্বটা অবশ্য রঘুনাথ রাজভর নিয়েছিলেন মা আর ছেলের কথার ভেতর ঢুকে, 'হরিপদ, তোমার মায়ের খুব ইচ্ছা হয়িছে তোমার সংসার দেখার আর সংযোগে কন্যাও পায়িছি বড় উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায় তোমার গায়ে বিয়ের জল পড়বি...'

দীর্ঘদিন বাড়িছাড়া হরিপদ এই আকস্মিক আয়োজনে প্রস্তুত ছিল না। তার ওপর না দেখে না শুনে কারও সঙ্গে ছাদনাতলায় বসতে হবে আজীবন পাশে অঙ্গীকার নিয়ে, এটা যেমন নামঞ্জুর ছিল হরিপদর তেমনি অভিমান জমেছিল বাবা-মায়ের এই স্বেচ্ছাচারী আচরণে, বিবাহ...আমার বিবাহ...

হরিপদর চোখে জমে থাকা নিরুৎসাহ দেখে প্রাণ কেঁপে উঠেছিল মালতী রাণীর। তাহলে কি বাছাধনের জন্য পাঁচ ঢাকে হলুদ কোটা হবে না? পেতলের কলসে আয়স্তি বউদের নিয়ে ঘাটে যাওয়া হবে না জল সইতে? আর ওই যে রুপার মাকড়ি সেটাও কি আসবে না স্যাকরার ঘর থেকে?

প্রশ্নগুলো মালতী রাণীকে অপদস্থ করার আগেই রঘুনাথ রাজভরের কাছে থেকে এসেছিল কঠিন আদেশ, 'হরিপদ, বাপের মান রাখতি যা করতি হয় তাই করো...'

হরিপদ রেখেছে বাপের মান। সকল অসন্তোষ সকল অভিমান মনে ভেতর ডুবিয়ে রেখে শোলার টোপর পরে চলে এসেছে সোনাডাঙা বিলের ঘাটে। এই ঘাটেই তো বাপ তার জীবনের রশি বেঁধে দিয়েছে। তবে বাপের কথার মান রাখতে চুপচাপ ছাদনাতলায় বসতে রাজি হলেও জীবনের বাকি হিসেবটুকু হরিপদ ঠিকই